বাংলাদেশ, মুসলমান-সমাজ ও প্রতিবাদী সংস্কৃতি

অরুণ সেন

'বাংলাদেশ' সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই ঐতিহাসিক ক্রমে সেই দেশের (বা রাষ্ট্রের) জন্মকাহিনি এবং পরিবর্তন-রূপান্তরের ইতিবৃত্তকে জানতে হয়। বাংলাদেশ-এর আধুনিকতায় পৌঁছোতে গেলে সেই পাঠ খুবই জুরুরি।

১৯৪৭-এর দেশভাগের আগে ছিল অখণ্ড বাংলা—কিন্তু তারও খণ্ডাংশে একটা পার্থক্য অবশ্য নিহিত থাকত আগেই। তারই একটি অংশকে তখন কথাসূত্রে বলা হত 'পূর্ববঙ্গ'। পদ্মার এপারের রাঢ়-বঙ্গ এবং ওপারের পূর্ব-বঙ্গ দেশ-পরিচয়ে এক হলেও অনেক বিষয়েই তাদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। একই বাংলাভাষার নানা আঞ্চলিকতা, সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতির লক্ষণ টের পাওয়া যেত শহরে ও গ্রামে। ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের মেলামেশা সত্ত্বেও পূর্বপারের এই দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য তো মানতেই হয়। বাংলাদেশের আধুনিকতাকে জানতে হলে, কীভাবে সেই মুসলমান-সমাজেও পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতি ঘটল, তা ঐতিহাসিক ক্রমিকতাতেই অনুধাবন করতে হয়। রাজনীতির সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির আন্দোলন কীভাবে সে-দেশের মুসলমানকে পৌঁছে দিয়েছিল তার নিজস্বতার বোধের মধ্যেও তাকে অতিক্রম করে সামগ্রিকতার বোধের জগতে—বাস্তবের সক্রিয়তা বা কার্যক্রমে। সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠপটই উন্মোচিত হতে পারে পরবর্তী আলোচনায়। সেই উন্মোচনের সচেতনতার বিবৃতি শুরু হয়েছিল অন্তত বছর ১৩ আগে— কিন্তু তা এখনো অবান্তর হয়ে যায়নি।

গত শতাব্দীর বিশের দশকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রতিবাদী চেতনার জন্ম হল। কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? সে-সময়ে বঙ্গীয় সমাজে, বিশেষত মুসলমান সমাজে, নানা ধরণের গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেই গোঁড়ামি সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তার বিরুদ্ধেই ১৯২৬-এ পূর্ববঙ্গের ঢাকায় এক প্রতিবাদী সাহিত্যসংস্কৃতির আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কয়েক বছর আগেই ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কিছু তরুণ শিক্ষক ও ছাত্র মিলিতভাবে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন অচিরে। তারই নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। অন্যতম উদ্যোক্তা কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, এই 'সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক' প্রতিষ্ঠানের মূল মন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তি'— 'বিচারবুদ্ধির অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান।' কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন অগ্রণী তাঁরা হলেন আবুল হুসাইন ও কাজী মুতাহার হুসাইন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রধান কাজ ছিল 'শিখা' পত্রিকার প্রকাশ— বস্তুত সেই পত্রিকাটির মধ্য দিয়েই তাঁদের পরিচিতি। আর সেই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রকাশক হিসেবে আবদুল কাদির এবং সম্পাদক হিশেবে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল। এই সংগঠন এবং পত্রিকার প্রচার যে খুব ব্যাপক ছিল তা নয়, কিন্তু 'ঢাকায় উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা জগরণের সাড়া পড়িয়া যায়।' (আবদুর রহমান খাঁ, 'আমার জীবন' ঢাকা,

১৯৬৪)। 'শিখা'-র সঙ্গে হয়তো তুলনা হয় না, কিন্তু তার পাশাপাশি কলকাতা ও ঢাকা-র শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এরকম নতুন চিন্তার উদ্বোধক আরো কিছু পত্রিকার কথা বলেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। যেমন, কলকাতা থেকে 'সওগাত' ছাড়াও 'খাদেম' (১৯২৬), 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯২৬), 'গণবাণী' (১৯২৬), 'সাহিত্যিক' (১৯২৭), 'নওরোজ' (১৯২৭), 'মোয়াজ্জিন' (১৯২৮), এবং ঢাকা থেকে 'তরুণপত্র' (১৯২৫), 'অভিযান' (১৯২৬), 'জাগরণ' (১৯২৮), 'সঞ্চয়' (১৯২৮) ইত্যাদি (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সংকলিত ও সম্পাদিত 'শিখা সমগ্র', ঢাকা, ২০০৩)। অবশ্য গোঁড়া মুসলমানদের যে-সব পত্রিকা সমকালেই বেরোত, যেমন 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মোসলেম দর্পণ, 'ইসলাম নূর', 'শরিয়তে এসলাম' ইত্যাদি, সেগুলো অনেকবেশি শক্তিশালী ও বহুলপ্রচারিত, কিন্তু 'শিখা' ও সহধর্মী পত্রিকাগুলো বলা বাহুল্য মুক্তচিন্তার প্রচারক বা প্রতিরোধের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থাৎ, এ সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষের সংখ্যা ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে এবং তাঁদের একটা বড়ো অংশ আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, মননশীলতার ও সৃজনশীলতার নানা দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দুর ব্যবধান একটু একটু করে হলেও হ্রাস পেতে থাকে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে-সব নতুন চিন্তা ও সক্রিয়তা দানা বাঁধছে, তাঁরাও তার শরিক হতে থাকেন। ১৯৩৬-এ ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংঘাতের পটভূমিতে যে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' এবং সেই সূত্রে কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই প্রভাব এসে পড়ে ১৯৩৯-এ ঢাকায়। ১৯৪০-এ গেন্ডারিয়া হাইস্কুলের ময়দানে কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে পূর্ববঙ্গে সংঘের প্রথম সম্মেলন। ১৯৪২-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনের সময় সোমেন চন্দ্রের মৃত্যু এবং সে বছরই সংঘের নতুন নামকরণে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' পূর্ববঙ্গে, প্রধানত ঢাকায়, এক 'প্রগতিশীল সাহিত্য পরিবেশ' সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু খুবই সংখ্যাল্প এই শিক্ষিত প্রগতিশীলেরা তখন পূর্ববঙ্গে। তার বাইরে অধিকাংশ মুসলমানই, এমনকি শিক্ষাপ্রাপ্তরাও, রক্ষণশীল ও ধ্যানধারণার দিক থেকে পশ্চাদ্‌মুখী। রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশটাই ছিল তা-ই। তাই ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবের পরিণতিতে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকরা পাকিস্তানি আদর্শের পক্ষে দলবদ্ধ হন এবং ১৯৪২-এ কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' তৈরি করেন। এবং তার পরে-পরে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। ১৯৪৩-এ ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সভাপতি এবং সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদক। সংসদ-এর লক্ষ্যই ছিল ইসলামি ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং ইসলামি আদর্শ প্রচার করা।

'১৯৪৪-এর জুলাইয়ে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন'—সেখানেও মুসলমান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংক্রামিত করতে চাওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানি চেতনা'। সাহিত্য সংসদ-এর সম্মেলনের চেয়ে এ-সম্মেলন ছিল আরো ব্যাপক ও উগ্র।

অর্থাৎ, নব-শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রথম থেকেই দুটি ধারা তৈরি হল। তার

মধ্যে একটি ধারা তো ছিলই, পেছন দিকে মুখ ফেরানো এবং প্রাচীন অনুশাসনের আনুগত্য। আর তার পাশে, প্রথমে যতই ক্ষীণভাবে হোক, এই নতুন প্রতিবাদী বা প্রতিরোধী সংস্কৃতি— ভাবনা।

দুই

১৯৪৭-এ পাকিস্তান গঠিত হবার পর থেকেই এই দুটি ধারাই প্রবলভাবে দ্বন্দ্বোন্মুখ হল। পাকিস্তানি আবহাওয়ায় প্রগতিবিমুখ চিন্তাধারার প্রসার খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ের পুঁথি সাহিত্যের অনুসারী রচনার প্রাচুর্য ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উচ্চকণ্ঠ খুবই নজরে পড়ে। (দ্রষ্টব্য ঃ হুমায়ুন আজাদ, 'ভাষা আন্দোলন ঃ সাহিত্যিক পটভূমি, ঢাকা, ১৯৯০)। কিন্তু, অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্যসংস্কৃতির প্রতিবাদী চেহারাটাও যে উঠে এল, সেটাই ব্যতিক্রমী ঘটনা।

দুটি প্রধান সূত্রকে আশ্রয় করে এই প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল্যায়ন। এটা ঠিক, দ্বিজাতিতত্ত্বকেই অবলম্বন করে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল, এবং ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবেই তার পরিচয়—কিন্তু সেই ইসলামের প্রত্যক্ষ চেহারায় যে অতীতচারী অন্ধ কূপমণ্ডূকতার প্রাধান্য ছিল, এবং তাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রধান হয়ে উঠেছিল, সেটা সকলে মানেননি। তাই ইসলাম ধর্মের শুদ্ধতা নিয়ে, তার আলোকিত দিকগুলি নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গেল।.বোঝা গেল, ইসলাম ধর্মের অনুগতদের মধ্যেও প্রগতিভাবনা নেই এমন নয়। কিন্তু তাঁদের দেখা ইসলামের আদর্শের সঙ্গে মিল নেই ইসলামের রাষ্ট্রীয় চরিত্রের। দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্থান। পাকিস্তানবাদী উগ্রপন্থীরা উর্দু ভাষার পক্ষে এবং পাক-সংস্কৃতি নামক এক বস্তুর সমর্থনে উৎসাহিত হয়েছে। কিন্তু তার বিপক্ষে, এবং বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতির সপক্ষে একাত্মতা অনুভব করেছে বাঙালি মুসলমানদের অনেকেই। এভাবেই সংস্কৃতির দুটি ধারার দ্বন্দ্ব ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের সূচনা-পর্বেই।

দ্বন্দ্বের সূচক হিশেবে এই যে দুটি প্রসঙ্গের কথা বলা হল, তা সর্বপ্রথম যে সংগঠনের প্রতিবাদীমুখী চেহারার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেল, তার নাম 'তমদ্দুন মজলিস'। ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ গঠন করেছিলেন এটা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'ইসলামী আদর্শ অনুসারী প্রগতিশীল' একটি আন্দোলনকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ইসলামেরই অনুগত বলতেন, এবং সেই আদর্শেরই টানে নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করে 'সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদে'র ভিত্তিতে একটি 'সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন', অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, গড়ে তুলতে চাইলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত গৌরবজনক আয়ুষ্কালে 'তমদ্দুন মজলিস'-এর প্রধান অবদান ছিল ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল ১৯৪৮-এ ও ১৯৫২-তে, প্রাথমিকভাবে তাতে 'তমদ্দুন মজলিস'-এর সক্রিয় ভূমিকা। বস্তুত তাদেরই কর্মতৎপরতায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'— ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে। পরবর্তীকালে অবশ্য ভাষা ও সংস্কৃতির নানা ব্যাপারে মজলিস-এর মধ্যে মতভেদ পাকিয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলতা

তাকেও গ্রাস করে। ১৯৫৪-এর পরে বস্তুত তার অস্তিত্বই গৌণ হয়ে যায়।

তুলনায় আরো প্রাগ্রসর ও অপোসহীন সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এল ১৯৫১-তে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃতি সংসদ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বলেই পরে এর নাম হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ'। মূলত সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সাম্যবাদী ছাত্র ও শিক্ষকদেরই উদ্যোগ ছিল। আর পেছনে ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও খান সারওয়ার মুরশিদদের মতো ব্যক্তিরা। পূর্ববাংলার বহু তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও সংস্কৃতিসেবীরা যোগ দেন এই সংগঠনে। বিভিন্ন কর্মসূচিতেই টের পাওয়া যায় এর প্রগতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র—যেমন, বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকাভিনয়, দেশাত্মবোধক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান, বর্ণময় পোস্টার বা দেয়ালপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক এই সংগঠন কিন্তু তার সীমা ছাড়িয়ে, অন্তত ষাটের দশক পর্যন্ত, 'গোটা পূর্ববাংলায় সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি সংসদ পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করে।'

দেশভাগের আগে ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর কথা মনে আছে, কিন্তু ১৯৫২-তে যে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে নাম ছাড়া কোনো মিলই নেই এই নতুন সংগঠনের। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন এর সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদ প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। 'সওগাত'-এর সম্পাদক নাসিরউদ্দীন ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। এতেই স্পষ্ট হয়, যে কথা বলেছেন হাসান হাফিজুর রহমান, সে সময়ের 'প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করেনি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বতো কৃতিত্বের দাবিদার।' ১৯৫৩-তে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সংকলন, ১৯৫৪-তে ঢাকার সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৫-তে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনুষ্ঠান ইত্যাদি 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এরই অবদান।

তিন

পাকিস্তান আমলের প্রথম থেকেই বাংলাভাষার ওপর যে-সব পদ্ধতিতে আঘাত হানা হচ্ছিল। বাংলা ভাষার মধ্যে বেপরোয়াভাবে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া, আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করা। তার বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সম্মেলন, 'তমদ্দুন মজলিস'-এর প্রচার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা, পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র বাংলা ভাষার সপক্ষে দাবি এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর আন্দোলন ক্রমাগত ঘটে চলেছে। ১৯৪৮-এ প্রথম এবং ১৯৫২-তে প্রবলতর ভাষা আন্দোলন তো আসলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই যা কালক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সময়েই পৃথকভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪-এর মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে অন্তত পাঁচটি স্মরণীয়

সাহিত্য সংস্কৃতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মনোভাব নিয়েই। কালানুক্রমিক তার উল্লেখ করা হল ঃ

ক. ১৯৪৮-এ ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানি চেতনার হয়তো কোনো স্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়নি, বরং অনুষ্ঠানসূচির নানা পর্যায়ে, যেমন গোলাম মোস্তাফা প্রমুখের ভাষণে, বরং তার প্রশ্রয়ই ছিল— কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালি-চেতনা সম্পর্কে সমর্থন ও আনুগত্যও অনুভূত হয়েছিল। আরো একটি দিক উল্লেখযোগ্য ঃ সে-সময়ের উগ্রবাদী রাজনীতির প্রকোপে পূর্ববঙ্গের রবীন্দ্রবিরোধী মার্কসবাদীরা যেমন এই সম্মেলন বর্জন করেছিলেন (যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের সামগ্রিক ঐক্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমর্থনই বেরিয়ে এসেছিল প্রধান উদ্যোক্তাদের ভাষণে), তেমনি অন্য কারো-কারো কথায় 'নতুন পাকিস্তানী সাহিত্য'-র প্রত্যাশা উচ্চারিত হয়েছে। মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিয়ে শেষ করলেও তিনিই সেই বিখ্যাত উক্তি করেছেন ঃ 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী।' সেই ভাষণে একদিকে বঙ্গসংস্কৃতিতে মুসলমানদের গৌরবজনক ভূমিকার কথা যেমন বলা হয়, তেমনি বলা হয় হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ অবদানের কথা।

খ. ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। পাকিস্তানের জন্মের পরে গঠিত 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক' একসঙ্গে মিলে ১৯৫১-র ১৬ মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মূল সভাপতি এবং বেগম সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি। কমিউনিস্টদের ব্যাপার এই অভিযোগ তুলে সোরগোল করা হয়েছিল— অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবুল ফজলের স্মৃতিচারণে জানা যায়। তা সত্ত্বেও সম্মেলন যে সফল হয়েছিল, সে-বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। সম্মেলনের বক্তৃতামালায় প্রায় প্রত্যেকের কথায় প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সংস্কৃতির উদার প্রেক্ষাপটের বিষয়ে আগ্রহ। চিত্রপ্রদর্শনী ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল এই উপলক্ষে।

গ. ১৯৫২-তে কুমিল্লায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিশ'-এর প্রেরণায় ১৯৫২-র ২২-২৪ আগস্ট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়, কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন সংগঠন যোগ দেয়। এখানেও মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। বামপন্থীরা প্রধানত উদ্যোক্তা। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংস্কৃতির সমন্বয় এবং 'মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্যবাদ'-এর ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। সে-কারণেই বোধহয় এটাও সরকার বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলন রূপে আখ্যাত হয়। তিন দিন ধরে সংস্কৃতির নানা বিচিত্র বিষয়ে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও লেখকেরা অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েন বা আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পড়া হয়, পরিবেশিত হয় সবরকমের সংগীত, অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের নাটক। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা অংশ নেন।

ঘ. ১৯৫২-তে ঢাকায় 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। 'তমদ্দুন মজলিস'-এর উদ্যোগে ১৯৫২-র ১৭-২০ অক্টোবরে ঢাকায় এই যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার মূল প্রেরণা ছিল 'মানবকল্যাণকর' ইসলামি আদর্শ। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে বা 'গোঁজামিল' দিয়ে নয়, তার মধ্যে নিহিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরাই ছিল লক্ষ্য। দেশ-বিদেশের ইসলাম ধর্মের পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা অনেক প্রবন্ধ পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন ইসলামি ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার শুদ্ধতা বিষয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পূর্ববঙ্গের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বড়ো করে দেখেছেন। ইসলামকে বিকার থেকে উদ্ধার এবং স্বাদেশিকতার বোধের উন্মোচন, দুটোই ছিল 'তমদ্দুন মজলিশ'-এর এই সম্মেলনের দায়। তাই তো এই সম্মেলনকে অনেকেই দেখেছেন 'ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে' এবং বিপরীত দিক থেকে তা সমালোচিত হয়েছিল ইসলাম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার চক্রান্ত হিসেবে।

ঙ. ১৯৪০-তে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির যে সাময়িক উত্থান তারই পরিবেশে আয়োজিত হয়েছে এই সম্মেলন। ১৯৫৩ থেকেই তোড়জোড় হলেও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৫৪-র ২৩-২৬ এপ্রিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন এর উদ্বোধক এবং সভাপতি আবদুর গফুর সিদ্দিকী। এই সম্মেলন উপলক্ষেই পূর্ববাংলার ১০৮ জন অগ্রণী শিল্পী সাহিত্যিক যুক্ত আবেদনপত্র প্রচার করেন। তার মূল ঘোষণা ছিল : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য'। কুসংস্কার, জাতিগত বা ধর্মগত বৈরীভাব, দেশব্যাপী নিরক্ষরতা সবেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন তাঁরা। সারা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশো জন প্রতিনিধি এসেছিলেন সম্মেলনে। বিদেশে থেকেও বিশেষত ভারত থেকে লেখকেরা গিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সাহিত্যিকও বেশ কয়েকজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন : কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিন ধরে বিরাট আয়োজন (বস্তুত জনপ্রিয়তার কারণে এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল), ঢাকা শহর জুড়ে বন্দোবস্ত, বিপুল জনসমাগম, প্রতিদিন আলোচনা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠান, বিশেষত মুশায়েরা। আবদুল লতিফের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দিয়ে সম্মেলনের শুরু এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' দিয়ে সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানের শুরু। ১৯৪৮-এর 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এ যে আশা ব্যক্ত করে ভাষণ শেষ করেছিলেন শহীদুল্লাহ, পাঁচ-ছ বছর পরে তিনিই নৈরাশ্য প্রকাশ করে বললেন : '১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড়ো আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে পরিস্থিতির হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মাতাল করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পাকিস্তানের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি আকুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তারা এইসব মাতলামিতে এমন মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্য সেবা,

যাতে দেশ ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না, বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চতর সরকারি কর্মচারী উশকানি দিকে কশুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা এমনকী বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে থাকলেন।' শুধু শহীদুল্লার উদ্বোধনী ভাষণেই নয়, অনেকেরই আলোচনায় পূর্ববঙ্গের নিজস্বতা এবং সামগ্রিকভাবে বাঙালি সত্তার দিকটি গুরুত্ব পায়। প্রায় প্রত্যেকেরই কথাবার্তায় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির কথা ওঠে। নানাদিক থেকে বিরোধী মহলে সমালোচনাও হয় এই সম্মেলনের— তাদের এমনকী মনে হয় আমন্ত্রিতদের নির্বাচনে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

চার

ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা আরো প্রসারিত হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের লড়াইও আরো তীব্র হয়ে উঠল, বিশেষত যখন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির অন্তর্কলহের পরিণতিতে শেষপর্যন্ত পাক সামরিক শাসন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। ১৯৫৮-তে আইয়ুব খানের আবির্ভাবের ঠিক আগে কিংবা সমসাময়িককালে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও সবচেয়ে উচ্চকিত হল।

১৯৫৭-তে অনুষ্ঠিত 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' একদিক থেকে যেমন যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধের সূচক তেমনি এই সম্মেলন উপলক্ষেই বাঙালির সবচেয়ে বড়ো ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। বিশেষত আগের সম্মেলনগুলির তুলনায়। 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। লীগের সম্মতি ছিল না, কিন্তু ভাসানী সম্পূর্ণ স্বাধীন উদ্যোগে এই সম্মেলন ডেকেছিলেন ১৯৫৭-র ৮-১০ ফেব্রুয়ারি। ভাসানীর জনপ্রিয়তার কারণেই সম্ভবত দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শয়ে-শয়ে সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা যোগ দেন প্রতিনিধি হিসেবে। একে একটা আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য বিদেশীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভারত থেকেও গিয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধকুমার সান্যাল, রাধারাণী দেবী প্রমুখ। বিরাট প্রস্তুতি কমিটি, বিশাল বিপুল আয়োজন, সম্মেলনস্থান পর্যন্ত অসংখ্য তোরণ, দেশবিদেশের বিভিন্ন মণীষীর নামে। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, এবং স্বাগত ভাষণ দেন ভাসানী স্বয়ং। সারাদিন ধরে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনাসভা— আলোচনার বিষয় অবশ্য অনেকসময় তার বাইরেও চলে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের লোকসংগীত, যাত্রা-নাটক, শরীর চর্চা এবং সেই সঙ্গে কুটিরশিল্পের প্রদর্শনী। আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন ঃ 'বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসর ব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতীয় সত্তা ও

সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।' সম্মেলনের একটা বড়ো রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। আবু জাফর শামসুদ্দীন তা-ই একে বলেছেন 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম সুস্পষ্ট দাবি এবং তজ্জনিত প্রয়োজনীয় সংগ্রাম।' কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মতো এত বড়ো 'ব্যাপকভিত্তিক' সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের আয়োজন বাংলাদেশের আর ঘটেনি বলেই অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে, খুবই স্বাভাবিক, সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে অনেক পত্রপত্রিকা, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ, 'দৈনিক আজাদ', এমনকী 'তমদ্দুন মজলিস')—প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে ভারতপ্রীতির অভিযোগে।

প্রগতিশীল সংগঠন ও তাদের সম্মেলনকে নস্যাৎ করাই শুধু নয়, মৌলবাদী চিন্তার মানুষেরা তাদের বিপুল জনশক্তি নিয়ে সাংগঠনিক ক্ষমতারও পরিচয় দেয় বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত সম্মেলনে। রাজনীতির মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের চেহারাটা থেকে যায়। তাই, এক বছর পরেই, ১৯৫৮-তে চট্টগ্রামে দেখতে পাই 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামেই 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হয়েছিল এবং তা ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ও সংস্কৃতির ঔদার্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু এবার তার চরিত্রটা ভিন্ন প্রকৃতির।

চট্টগ্রামের এই সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৮-র ২-৪ মে। মূল সভাপতি ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। অল্প আগেই ঢাকা, কুমিল্লা বা কাগমারির সম্মেলনে পাকিস্তানবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যবোধ জোরদার হয়ে উঠেছিল— চট্টগ্রামের সম্মেলনে যেন আবার সেই প্রাক্তনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হল, ইসলামি আদর্শের রূপায়ণের কথা বলা হল সোচ্চারে। তিন দিনের সভায় আলোচিত হল পাক-বাংলার আদর্শ ও সাহিত্য, পাক-বাংলার মনন, পাক-বাংলার চিত্রশিল্প। সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান একটি 'চমৎকার ইসলামি রূপ' প্রকাশ করবে, এই প্রত্যাশাই ছিল সকলের মুখে। এই সম্মেলনকে তাই 'পাক-বাংলা সাহিত্যাদর্শে' বিশ্বাসী শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্মেলন বলা চলে— যদিও আগে বা পরে উদারপন্থী ছিলেন বা হবেন, এমন বুদ্ধিজীবীরাও অনেকে এখানে হাজির ছিলেন। যেমন, রেজাউল করিম, আবুল কালাম, শামসুদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মাহফুজুল হক প্রমুখ। তাই দেখা যায়, পাকিস্তানি আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও, অনেকেই পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির নির্মাণের কথাও বলেছেন।

এমনকী ঢাকাতেও আইয়ুব খানের আবির্ভাবের পরপরই 'রওনক সাহিত্যসংস্থা' (১৯৫৮-তে স্থাপিত)-র মতো প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাই, যেখানে ঘরোয়া সাহিত্যসভাতে পাক-বাংলার পক্ষে নিজেদের ভাবনাকে সংহত করার সুযোগ করে নেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও মুহম্মদ বরকতউল্লাহ-র পরিচালনায় কিছুটা বয়স্ক বা প্রবীণ লেখকেরা। অবশ্য 'রওনক'-এর ভাবধারাকে সম্পূর্ণ একদেশদর্শী বলা চলে না— তাদের প্রকাশনাতেই নজরুল বিষয়ক পূর্ববাংলার প্রথম সংকলনটির লেখক-তালিকায় অন্যদের সঙ্গে সে সময়ের তরুণ প্রগতিশীল লেখকেরাও ছিলেন।

১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে যে পাকিস্তানের লেখকদের

সম্মেলন হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের অনেকেই। তার একটা বড়ো মাধ্যম হয়েছিলেন এনামুল হক। এই সম্মেলনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই ছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আনুকূল্য ছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রচ্ছন্ন হুমকিও ছিল পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শকে সমন্বিত ও বিকশিত করাই ছিল সম্মেলনের লক্ষ্য। তার জন্য নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসকেরা। এই সম্মেলনে প্রগতিবিরোধী লোকজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রগতিমুখী লেখকেরাও। এখানেই গঠিত হয় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' এবং তার কর্মসূচী পালিত হয় পূর্ব পাকিস্তানেও। তিনটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। তাতে মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আশরাফ সিদ্দিকী, কাজী মোতাহার হোসেন, আনিসুজ্জামান প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন। লেখক সংঘ পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন আরো অনেকে। সংঘের কার্যকলাপ অনুসৃত হয় ষাটের দশকেও।

পাঁচ

ষাটের দশক জুড়ে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের কালে, প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ল। ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশের দশকে যে আলোড়ন ঘটেছিল, তা শুধু তখন বড়ো একটা রাজনৈতিক মাত্রা পেল তা-ই নয়, আগের পর্বের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলোও আরো তীব্রতা পেল। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে প্রতি বছর একুশের গান গাইতে-গাইতে প্রভাতফেরি, রাস্তায় আলপনা, শহিদমিনারে ফুলের মালা এইসব আয়োজনের সঙ্গে সভা বা জমায়েত—ক্রমশই যেন বিস্তার পেতে থাকল। সন্‌জীদা খাতুন দেখিয়েছেন সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে, শুধু ভাষা-সাহিত্যেই নয়, সংগীত শিল্প বা মননচর্চায় প্রতিরোধের প্রেরণা কীভাবে সঞ্চারিত হল একুশে ফেব্রুয়ারির শিক্ষায়। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই, সেই পাকিস্তানের শাসকেরাও পালটা চাপ তৈরি করেছে অবিরল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন কিছুটা সফলও হয়েছে তারা। বহু লেখকই 'নিরাপত্তা' খুঁজেছেন, এবং হয়তো পেয়েছেনও। সরকারও ফাঁদ পেতেছে 'লেখক সংঘ' ইত্যাদি মারফত দাক্ষিণ্য বিলিয়ে। সন্‌জীদা খাতুনের ভাষায়, 'পাকিস্তান সরকার বেশ সুতো ছেড়েই খেলতেন।' কিন্তু সবমিলিয়ে সাফল্য আসেনি, বরং দেখা গেছে, সংস্কৃতি আন্দোলনে সমস্ত প্রচেষ্টাই 'একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষঙ্গী।' একুশে ফেব্রুয়ারি এই উচ্চারণটাই বছরের পর বছর কাটিয়ে একটা প্রতীকে পরিণত হল, সাংস্কৃতিক চেতনার উত্তরণ ঘটাল, মানুষকে পৌঁছে দিল রাজনৈতিক মুক্তিসন্ধানের রণাঙ্গণে। ভাষা-আন্দোলনের আগে, পাকিস্তানের গোড়াকার পর্বে, ভাষা নিয়েই বাঙালি মুসলমানের যে 'সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি', যার পরিণামে তৈরি হয় 'মুসলমানি বাংলা', কিংবা পরে প্রস্তাবিত হয় বর্ণমালা সংস্কার, রোমান বা আরবি হরফে বাংলা ইত্যাদি, তা ভাষা আন্দোলনের আবহে ও পরবর্তী ইতিহাসে সার্থক প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। প্রত্যাঘাতের চেষ্টাও অবশ্য কম হয়নি। ১৯৬০-এ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যখন জাহেদুর রহীম গান গাইছেন 'আমার সোনার বাংলা', তখন হামলা চালানো হচ্ছে ইসলামী ছাত্র সংঘের প্ররোচনায়। ১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের সময় 'ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা' প্রচার চালাতে থাকে

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ঃ 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে (কোহেনদার) ডাকের সমান এবং এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু।' রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, তাঁর শতবর্ষ নিয়ে প্রবল বিতর্ক উশকে দেওয়া হয়েছিল। পরেও ১৯৬৫-তে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা কিংবা রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সরকারি আমলাদের বা পেটোয়া মানুষজনের বিবৃতি-প্রচার সবই ঘটেছে। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করেই রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সাফল্য, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীতের সপক্ষে লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সংহত প্রতিবাদ। তাই তো ওয়াহিদুল হক বলতে পারেন, পূর্ববঙ্গের 'রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক... প্রতিরোধের বড়ো হাতিয়ার ..... রবীন্দ্রসংগীত।' শুধু রবীন্দ্রসংগীতই নয়, এ-কথা প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার সূত্রেই। এরকম আরো অনেকই আছে। ১৯৬৩-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'— 'পূর্ববাংলাকে বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা' দেওয়ার দাবিতে। ১৯৬৬-তে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবির পটভূমিতে, ছাত্রদের অংশগ্রহণে 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালন— দোকানের সাইনবোর্ড বা গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখার দাবিও ছিল তাতে। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা নববর্ষের উৎসব পালন। ১৯৬৪-তে প্রাদেশিক সরকার পয়লা বৈশাখে ছুটি ঘোষণা করে এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষত বাংলা একাডেমীতে 'ঐকতান' গোষ্ঠীর আয়োজনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। ১৯৬৬-তে ছাত্র-ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রথম প্রভাতফেরি— 'এভাবে বাঙালির নববর্ষ পালনের ইতিহাস এই প্রথম।'

চল্লিশের দশকের কলকাতার গণনাট্য ও গণসংগীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশভাগের পরে যে-দুজন শিল্পী পূর্ব-পাকিস্তানে এসে সেখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করলেন, তাঁরা হলেন কলিম শরাফী এবং শেখ লুতফর রহমান। কলিম শরাফী মূলত রবীন্দ্রসংগীতের অসামান্য গায়ক হলেও, অন্যান্য সংগীত, বিশেষত গণসংগীত প্রচারেও একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন— প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে ঢাকায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুরারোপিত 'নবজীবনের গান' তাঁর মুখে তখন অনেকেই শুনেছেন। আর শেখ লুতফর রহমান তো একসঙ্গে গণসংগীতের রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক হিশেবে প্রায় কিংবদন্তি—গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে তাঁর প্রতিভার বিস্তার। পঞ্চাশের দশকের 'শিল্পী সংসদ' (যেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন আরেক অতুলনীয় গায়ক ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ) থেকেই যাত্রা শুরু। পাশাপাশি ছিল নিজামুল হকের নেতৃত্বে 'ধুমকেতু শিল্পী গোষ্ঠী', 'পাকিস্তান শিল্পী সংসদ', পি-পি-টি-এ (আই-পি-টি-এ-র অনুসরণে), শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে 'বালুচর', মাহবুর রহমানের নেতৃত্বে 'মস্তানা' ইত্যাদি। এই সময় পাকিস্তানের প্রবল নিষেধাজ্ঞার আবহওয়ায় স্বনামে যেমন, তেমনি নিত্যনতুন ছদ্মনামেও গড়ে উঠতে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আরেকটি প্রধান সংগঠন ছিল চট্টগ্রামে 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী'—কলিম শরাফী তাদের সঙ্গেই যুক্ত হন। ১৯৫২ নাগাদ ঢাকায় খানিকটা সম্মিলিত উদ্যোগে, গণনাট্য সংঘের আদর্শে, তৈরি হল 'অগ্রণী শিল্পী সংঘ'। শেখ লুতফর রহমানের নেতৃত্বে তারাই প্রথম ১৯৫৩-র ২১ ফেব্রুয়ারির ভোরে হাসান হাফিজুর রহমানের লেখা 'মিলিত প্রাণের কলরব' গেয়ে প্রভাতফেরি বের করে। সে বছরই আবদুল লতিফের সুরে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' আলোড়ন তোলে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪-র 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'-এ প্রতি সন্ধ্যায়